নারীশিক্ষা বিস্তারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভূমিকা।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে যেসকল ভারতীয় মনিষী নারী শিক্ষা বিস্তার ও নারী মুক্তি বিষয়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছি-লেন, তার মধ্যে অন্যতম ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর কেবলমাত্র কলকাতার মধ্যবিত্ত সমাজে নারী শিক্ষার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেননি, তিনি গ্রাম-বাংলার নারী শিক্ষার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন। ভারতের এক নতুন ধারায় নারী মুক্তি আন্দোলন ও নারী শিক্ষার নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা করেছিলো।

শিক্ষার প্রসার

বিদ্যাসাগর 1857 খ্রি. সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হয়ে শিক্ষাসংস্কারের কাজে মনোনিবেশ করেন। তিনি সংস্কৃত কলেজের দরজা সকলের জন্য খুলে দেন এবং বাংলা ভাষার মাধ্যমে সহজে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য 'ব্যাকরন কৌমুদি' রচনা করেন। এছাড়া বাংলার জনশিক্ষা ও নারী শিক্ষা প্রসারে তিনি আপ্রান চেষ্টা করেন। তিনি বিশ্বাস করেন শিক্ষাই একমাত্র মানুষের মন থেকে অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করে মানুষের মনে প্রানের সঞ্চার ও মনুষ্যত্ব জাগিয়ে তুলতে পারে। এই জন্য তিনি গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন করেন। নারি সমাজের মুক্তির জন্য তাদের শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন তাই তিনি বিশ্বাস করেন।

বিদ্যালয় স্থাপন

এইজন্য তিনি নারী শিক্ষা প্রসারে বিশেষ উদ্যোগ নেন। নারি শিক্ষা বিস্তারের জন্য স্ত্রীশিক্ষা সম্মেলনী বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করেন। এইসময় 1849 খ্রি. বেথুন সাহেব বিদ্যাসাগরের সাহায্যে নারী শিক্ষার জন্য কলকাতায় হিন্দু কালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ছোট লাট হ্যালিডের সাথে একমত বিদ্যাসাগর নিজ খরচে 1855-58

খ্রি. মধ্যে) মেয়েদের শিক্ষার জন্য মেদিনীপুর জেলায় তিনটি, বর্ধমান জেলায় এগারোটি, হুগলি জেলায় 20 টি, নদীয়া জেলায় একটি, মোট 35 টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। যার মোট ছাত্রী সংখ্যা ছিল 3500 জন।

আর্থিক সমস্যায় ছিল, শিক্ষার রক্ষণশীল পরিবারকে শিক্ষায় সক্রিয় ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক সাহায্য

এই বিদ্যালয়গুলির আর্থিক সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি নারী শিক্ষা ভান্ডার গঠন করেন। বিদ্যাসাগরের এই মনোভাব দেখে পরবর্তীকালে রক্ষণশীল হিন্দু মেয়েদের স্কুল স্থাপনে প্রেরণা জাগিয়ে ছিলেন। ও রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারের অনেক মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে শুরু করেছিল। তবে আর্থিক সংকটের জন্য তিনি বিদ্যালয়গুলির শিক্ষা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি ব্রিটিশ শাসকদের সহায়তা পেয়েছিল। ~~হয়েছিলেন~~ ~~হয়েছিলেন~~

নারী মুক্তি আন্দোলনে বিদ্যাসাগরের অবদান লেখ।

উনিশ শতকীয় বাংলায় সমাজ সংস্কার সংক্রান্ত কর্মসূচীগুলির একটা বড়ো অংশ জুড়ে ছিল নারী সংক্রান্ত প্রশ্ন। নারীরা সমাজের বিভিন্ন স্তরে অংশগ্রহন করবেন। নারী সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার ও অন্যায় রীতিনীতি থেকে মুক্তি দেওয়া হবে, নারী শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে- এইসমস্ত চিন্তাভাবনা অনেক সংস্কারকের মধ্যেই ছিল। এই সময় নারীমুক্তি আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

বিধবা-বিবাহ আইন- বিধবা বিবাহ প্রচলনের বিষয়ে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ নেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। কেবলমাত্র বিদ্যাসাগরই নন উনিশ শতকের বেশকিছু সংস্কারকও বিধবা বিবাহকে সমর্থন করেছিলেন। নব্যবঙ্গদের উদ্যোগে ১৮৪২ খ্রিঃ 'বেঙ্গলস স্পেক্টর' নামে একটি পত্রিকাতে প্রথম সংখ্যায় বিধবা বিবাহকে সমর্থন করে একটি চিঠি প্রকাশিত করা হয়েছিল। একই পত্রিকায় পরবর্তী সংখ্যায় বিধবা বিবাহের সমর্থনে 'The Marriage of Hindu Widows' প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। নব্যবঙ্গের অন্যতম প্রতিনিধি ও ডিরোজিও-এর শিষ্য রাধানাথ শিকদার বিধবা বিবাহ প্রচলনের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরকে সাহায্য করেছিলেন।

বিদ্যাসাগর বিভিন্ন শাস্ত্র বিশেষত পরাশর সংহিতা পঠন-পাঠনের পর তিনি উদ্ধৃত করেন যে বিধবা বিবাহ প্রকৃত পক্ষে শাস্ত্রসম্মত। এরপর বিধবা বিবাহ সমর্থনে জনমত গঠন করেন। 1855 খ্রিঃ 15 নং রেগুলেশন জারি করে, 1856 খ্রিঃ 16ই জুলাই বিধবা বিবাহকে বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়। বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহকে বাস্তবে রূপদান করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালান। তিনি 10 টির বেশি বিধবা বিবাহ সম্পন্ন করান। 1856 খ্রিঃ 7ই ডিসেম্বর বাংলায় প্রথম বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়, কলকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের সঙ্গে কালীমতি দেবীর।

ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর নিজপুত্র নারায়ণচন্দ্রের সঙ্গেও এক বিধবার বিবাহ দেন। তৎকালীন সময়ে এই বিধবা বিবাহের পক্ষে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ সহযোগিতা করেন। বিদ্যাসাগর নিজ উদ্যোগে দরিদ্র বিধবাদের সাহায্যের জন্য 1872 খ্রিঃ স্থাপন করেন 'হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুয়িটি ফান্ড'। এখানে বিদ্যাসাগর নিজ রচিত পুস্তক বিক্রির সব অর্থ দান করেন। অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বিদ্যাসাগরের শ্রেষ্ঠ কীর্তি ছিল বিধবা বিবাহ প্রবর্তন

বাল্যবিবাহ রোধ

বিদ্যাসাগর বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে এই কুপ্রথা বন্ধের চেষ্টা চালান। তিনি বলেন বাল্যবিবাহ হল সমাজের একটি ব্যাধিস্বরূপ। এই ব্যাধিমুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে 'সর্বশুভকরী' পত্রিকায় 'বাল্যবিবাহের দোষ' নামক প্রবন্ধে বাল্যবিবাহের দোষ ও ত্রুটি সম্পর্কে লেখেন। তিনি আরও বলেন বাল্যবিবাহ হল কিশোরী কন্যাদের জীবন যন্ত্রণার অন্যতম উৎস। তাই তিনি এই প্রথা বন্ধের জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানান। তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে সরকার 1860 খ্রিঃ একটি আইন করে মেয়েদের বিয়ের বয়স ন্যূনতম 10 বছর ধার্য করেন।

বহুবিবাহ রোধ

বিদ্যাসাগর তৎকালীন হিন্দুসমাজ ও তৎকালীন কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রচলিত বহু বিবাহের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। বিদ্যাসাগর প্রমাণ করেন যে, এই প্রথা আদৌ শাস্ত্রসম্মত নয়। সরকারের নিকট এই প্রথার বন্ধের আবেদন জানান 1855 খ্রিঃ প্রায় 50,000 লোকের স্বাক্ষর নিয়ে একটি আবেদন পত্র সরকারের কাছে পেশ করেন। এবং বলেন এই প্রথা যাতে কঠোরভাবে বন্ধ করা হয়। তবে 1857 খ্রিঃ মহাবিদ্রোহের ফলে ঔপনিবেশিক সরকার ভারতীয় সমাজ ও ধর্মীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে চায়নি। তবুও বিদ্যাসাগর থেমে থাকেননি। বহুবিবাহের বিরুদ্ধে দুটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টা পরবর্তীতে অনেকাংশেই কমে যায়।

(শিক্ষা সংস্কারের 2 ও 4 নং প্যারা লিখতে হবে)

এইভাবে নারীশিক্ষা মুক্তির ক্ষেত্রে বিশেষ করে বিধবা বিবাহ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন বিদ্যাসাগর। তিনি বঙ্গীয় নবজাগরণের অন্যতম মূর্ত প্রতীক।